জনসংখ্যা, মানবসম্পদ ও আত্মকর্মসংস্থান

Population, Human Resource & Self-employment

ইউনিট ৪

ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। বর্তমানে এদেশের লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি। বাংলাদেশের মতো এতো ক্ষুদ্র দেশে এত জনসংখ্যা বিষয়টি খুবই আশঙ্কাজনক। অতি জনসংখ্যার চাপে এদেশে হাজারো সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই জনসংখ্যা সমস্যা এদেশের এক নম্বর জাতীয় সমস্যা। তবে এই জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের মাধ্যমে অর্থাৎ মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারলে বেকারত্ব দূর হবে এবং দেশ উন্নত হবে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৮ দিন

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৪.১: জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব

পাঠ ৪.২: জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রভাব

পাঠ ৪.৩: জনসংখ্যা তত্ত্ব

পাঠ ৪.৪: বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ

পাঠ ৪.৫: বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

পাঠ ৪.৬: মানবসম্পদ উন্নয়ন

পাঠ ৪.৭: বেকারত্ব ও আত্মকর্মসংস্থান

পাঠ ৪.১ জনসংখ্যার পরিমাপ ও ঘনত্ব
Population Measurement and Density

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- জনসংখ্যা পরিমাপের ধারনা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জনসংখ্যা ঘনত্ব নির্ণয় করতে পারবেন।

মূলপাঠ

জনসংখ্যার পরিমাপঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে দক্ষ জনশক্তি, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি অপরিহার্য উপাদান। জনসাধারণের কারিগরি জ্ঞান, কাজের উদ্দ্যেগ, মনোবল, দেশাত্মবোধক, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন চেতনা, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, আর্থিক ক্ষমতা ও যান্ত্রিক সহায়তা, সে সাথে একটি সুষ্ঠু এবং বাস্তবমুখী অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা থাকলে দেশের অগ্রগতি নিশ্চিত করা যায়। কোনো কোনো দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও পর্যাপ্ত জনসংখ্যার অভাবে সঞ্চিত সম্পদকে ব্যবহার করতে পারে না। আবার জনসংখ্যা বেশি হলে সে ক্ষেত্রেও উন্নয়ন হয় বাধাগ্রস্ত। এ কারণে উন্নয়নের জন্য সম্পদ ও জনসংখ্যা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানা প্রয়োজন। যেমন- অঞ্চলটিতে যে সংখ্যক লোক বাস করে তন্মধ্যে কত জন পুরুষ, কত জন নারী, তাদের বয়স কাঠামো কী, প্রতিবছর কত জন জন্মগ্রহণ করছে, কতজন মারা যাচ্ছে, ইত্যাদি। তাছাড়া তাদের সামাজিক , অর্থনৈতিক, এমনকি শারীরিক অবস্থা কিরূপ। তথ্যসমূহ বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা হয়। এ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে-

১. আদম শুমারি,
২. আবশ্যকীয় তালিকাভুক্তি,
৩. নমুনা জরিপ।

কোনো দেশে কত জন লোক বাস করে তা জানার সরাসরি উপায় হচ্ছে প্রতিটি লোককে গণনা করা। আদমশুমারি পদ্ধতিতে লোক গণনার সময় প্রকৃতপক্ষে তাই করা হয় এবং সাথে উপরিউক্ত তথ্যসমূহও সংগ্রহ করা হয়। প্রতি ১০ বছর অন্তর একটি নির্দিষ্ট সময়ে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ১৯৭৪ সালে, তারপর ১৯৮১, ১৯৯১ , ২০০১ এবং ২০১১ সালে আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিদিনই কিছু শিশু জন্মগ্রহণ করছে আবার কিছু লোক মারা যাচ্ছে। দেশ বা কোনো এলাকা থেকে অনেকে হয়তো বাইরে চলে যাচ্ছে, অনেকে আবার বাইরে থেকে সেখানে আসছে। এসব তালিকাভুক্তকরণের মাধ্যমেই দুই আদমশুমারির মধ্যবর্তী সময়ের জনসংখ্যা সম্পর্কে জানা যায়। আদমশুমারি এবং তালিকাভুক্তিকরণ খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তাই আজকাল নমুনা জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। নমুনা জরিপে দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়, তবে কিছুটা ভুলের সম্ভাবনা থাকে। এলাকা বাছাই করার সময় তা যেন প্রতিনিধিত্বকারী হয় সে সম্পর্কে সতর্ক থাকলে এ ভুলের পরিমাণ কমানো যায়।

জনসংখ্যার ঘনত্বঃ

কোন দেশের ভৌগলিক সীমানার মধ্যে সাধারণত প্রতিবর্গমাইলে যতজন মানুষ বসবাস করে তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়। ঘনত্ব কথাটি পরম এবং আপেক্ষিক উভয় অর্থে ব্যবহার করা হয়। পরম অর্থে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে কোন দেশে প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যার বন্টনকে বুঝায়।

কোন দেশের মোট জনসংখ্যাকে মোট আয়তন দ্বারা ভাগ করলে জনসংখ্যার ঘনত্ব পাওয়া যায়। অর্থাৎ জনসংখ্যার ঘনত্ব একটি দেশের মোট আয়তনের প্রেক্ষিতে মোট জনসংখ্যার অনুপাতকে নির্দেশ করে। জনসংখ্যার ঘনত্বের ক্ষেত্রে দেশের

অন্তর্গত সমতল ভূমি, পাহাড়ী এলাকা, নদী, খাল ও সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল, মরুভূমি, বনভূমি, জলাভূমি প্রভৃতি স্থানে সমানভাবে মানুষ বসবাস করছে বলে ধারণা করা হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয়ের সূত্র নিম্নরূপঃ

জনসংখ্যার ঘনত্ব, $DP = \frac{TP}{TA} = \frac{\text{দেশের মোট জনসংখ্যা}}{\text{দেশের মোট আয়তন}}$

দেশের মোট আয়তন স্থির থাকা অবস্থায় অথবা নির্দিষ্ট ভৌগোলিক আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়; বিপরীত অবস্থায় জনসংখ্যার ঘনত্ব কম হয়। সাধারণত ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, মাটি, দেশের আয়তন, জন্মহার, অর্থনৈতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির স্তর, জীবন যাত্রার পদ্ধতি, যাতায়াত ব্যবস্থা, শিল্পোন্নয়ন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবীয় উপাদানের উপর জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে। স্থানভেদে এই উপাদানগুলো স্বতন্ত্র হয় বলে জনসংখ্যার ঘনত্বও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এক্ষেত্রে জনসংখ্যার ঘনত্ব কোন বিশেষ এলাকায় জনসংখ্যার কেন্দ্রীভবনের মাত্রা প্রকাশ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যা ও জনসংখ্যার ঘনত্ব কিভাবে পরিমাপ করতে হয় তা শিখবেন।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য জনসংখ্যার গুরুত্ব অনেক। প্রতি বর্গমাইলে কতজন মানুষ বসবাস করে তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কতসালে সর্বপ্রথম আদমশুমারী হয়?

ক) ১৯৮১ খ) ১৯৯১ গ) ১৯৭৪ ঘ) ১৯৭২

২। বাংলাদেশে সর্বশেষ আদমশুমারী হয় কত সালে?

ক) ২০০১ খ) ২০১১ গ) ২০০৫ ঘ) ২০১৫

৩। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত?

ক) ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ খ) ১৫ কোটি ১০ লক্ষ গ) ১৬ কোটি ঘ) ১৬ কোটি ১০ লক্ষ

পাঠ ৪.২ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ও প্রভাব
Causes of Increase in Population and Impact

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ :

বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলি নিম্নে দেওয়া হলো-

(ক) প্রাকৃতিক কারণসমূহ-

১. জলবায়ুর প্রভাব: বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ। এ জলবায়ুতে পুরুষ ও মহিলারা অল্প বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং প্রজননে সক্ষম হয়। তাছাড়া বন্ধুভাবাপন্ন আবহাওয়া থাকায় শীতপ্রধান দেশের মেয়েদের তুলনায় বাংলাদেশের মেয়েদের প্রজনন ক্ষমতা বেশি থাকে।

২. ভৌগলিক অবস্থান: বাংলাদেশ মৌসুমি অঞ্চলে অবস্থিত উর্বর পলিমাটি সমৃদ্ধ দেশ। এখানে অল্প পরিশ্রমে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায় বিধায় সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরামদায়ক ও স্বল্প ব্যয়বহুল। প্রচুর বৃষ্টিপাত, মাটির উর্বরতা, সমতল ভূ-প্রকৃতি উত্যাদি কারণে সুপ্রাচীন কাল থেকেই এদেশ উচ্চ প্রজননসমৃদ্ধ দেশ। ভৌগলিক দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকায় এদেশে প্রজননশীলতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

(খ) সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণসমূহ-

১. জন্ম নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের ত্রুটি-বিচ্যুতি: বাংলাদেশে জন্ম নিয়ন্ত্রন কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। অদক্ষ, দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসন, কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী পরিচালনা করা হয় বিধায় কার্যক্রমের সাফল্যের হার অত্যন্ত কম। এ ছাড়া গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় গোড়ামীর কারণে পরিবার-পরিকল্পনা মাঠকর্মীরা অনেক পরিবারে প্রবেশ করতে পারেনা। অশিক্ষিত থাকার কারণে অনেক পরিবারে কর্তাব্যক্তি অতি সন্তানের কুফল বুঝতে অক্ষম থাকেন এবং তাকে সেটা বুঝানোর চেষ্টা করলে বেশিরভাগ সময়ই উল্টো প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এ ধরনের পরিবারের মহিলারা ঘরের বাহিরে যাওয়ার কোন সুযোগ পায়না এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ ব্যবহার করার জন্য কোন অনুমতি পায় না। এভাবে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে এবং সামাজিক বাধার কারণে বাংলাদেশে প্রজনন হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

২. বহু বিবাহ: বাংলাদেশে বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলোতে বহু বিবাহ করার প্রবণতা দেখা যায়। বহুবিবাহতে এক পুরুষের ঔরসে অনেক সন্তান জন্ম নেওয়ায় প্রজনন বৃদ্ধি পায়। ১৯৮০ সালে সুলতান আহমেদ Fertility levels and Differentials in Bangladesh: A Macro –level analysis নামক এক গবেষণাপত্রে উল্লেখ করেন, "বহু বিবাহ প্রথা একই পরিবারে অনেক স্ত্রীর সমাবেশ ঘটায় বলে প্রত্যেক স্ত্রী প্রতিযোগীতামূলক মনেবৃত্তি নিয়ে ঐ পরিবারে অধিক সন্তান জন্মদানে সচেষ্ট হয়।"

৩. স্বল্প শিক্ষার হারঃ বাংলাদেশের জনগণের এক বৃহৎ অংশ নিরক্ষর। এমন কি সমগ্র জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ এখণও স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন নয়। এই বিপুল পরিমাণ অশিক্ষিত মানুষ নানা কুসংস্কারে আবদ্ধ । তারা প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অনুগত থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রনের প্রতি অনীহা বোধ করে। আবার অশিক্ষিত মহিলারা ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে এক রকম গৃহবন্দী থাকতে বাধ্য হয়। পরিবারে তাদের অবস্থান এবং মতামতের তেমন কোন গুরুত্ব নেই। সন্তান জন্মদানে পুরুষরাই মূলত প্রধান ভূমিকা পালন করে। এসব কারণে বাংলাদেশে প্রজনন হার স্বাভাবিকভাবেই অত্যন্ত উচ্চ হয়।

৪. অসুস্থ বিনোদনঃ বাংলাদেশ মুসলিম দেশ হলেও আইনের ফাঁক ফোকর দিয়ে এদেশে বিভিন্নভাবে অসুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ছে। সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থার অভাবে মানুষ অসুস্থ বিনোদনের দিকে ঝুকে পড়ছে। ফলস্বরূপ অধিক সন্তানের জন্ম হয় ও প্রজনন হার বৃদ্ধি পায়।

৫. চিত্ত বিনোদনের অভাবঃ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃতি চর্চা ও চিত্ত বিনোদনের কোন আধুনিক সুযোগ সুবিধা নেই। বিনোদন, বেড়ানো, শপিং ইত্যাদি সবই শহর কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। গ্রামের জনসাধারনের পক্ষে সর্বদা শহরে গিয়ে চিত্ত বিনোদনের সুবিধা লাভ করা সম্ভব হয় না। ফলে দরিদ্র জনসাধারনের জন্য স্ত্রী সঙ্গ লাভই চিত্ত বিনোদনের প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচিত হয়। যার ফলে গ্রামাঞ্চলে প্রজননের হার উর্ধ্বমুখী হয়।

৬. মনস্তাত্ত্বিক কারণঃ বাংলাদেশে বিবাহিত প্রতিটি মহিলাই সন্তানের মা হতে চায় এবং ছেলে সন্তান তাদের একান্ত কাম্য। তারা জন্ম নিয়ন্ত্রনের সকল ব্যবস্থার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে। তাদের ধারণা ঐগুলো ব্যবহার করলে তারা অসুস্থ হয়ে যাবে। এমনকি তারা সাময়িকভাবে সন্তান উৎপাদন বন্ধ রাখতেও আগ্রহী নয়। তারা মনে করে যে, সাময়িকভাবে সন্তান উৎপাদন বন্ধ রাখলে তারা চিরতরে সন্তান উৎপাদন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। তাদের এ সকল ভ্রান্ত মনোভাবের কারণে জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

৭. খাদ্যাভ্যাসঃ বাংলাদেশের সাধারণ জনগণ খাদ্য গ্রহনের ক্ষেত্রে ভাত, আটা, আলু, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য বেশি গ্রহণ করে থাকে। দারিদ্র্যের কারণে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ইত্যাদির মতো প্রোটিন ও আমিষ জাতীয় খাদ্য কম গ্রহণ করে। এমন অনেক পরিবার আছে যারা শুধু বছরে একবার কোরবানীর ঈদের সময় মাংস খাওয়ার সুযোগ পায়। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য মানুষের প্রজনন হার বৃদ্ধি করে। ফলে বাংলাদেশে সাধারণ পারিবারগুলোতে জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

৮. দারিদ্র্যঃ বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং এদেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করে। আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য অনেক পুরুষই অল্প বয়সে বিবাহ করে এবং বেকারত্বের কারনে ঘরেই অবস্থান করে। এগুলো প্রজননের উচ্চ হারের জন্য দায়ী প্রধান কারণ।

৯. শিশু প্রতিপালনে স্বল্প ব্যয়ঃ বাংলাদেশে অধিকাংশ মানুষের জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। দরিদ্র ও অশিক্ষিত পরিবারে শিশু লালন পালনের ব্যয়ভার অত্যন্ত কম হয়। এ ধরনের পরিবারে দারিদ্র ও অজ্ঞতার কারণে শিশুদের খুব একটা পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয় না। শিশুদের ভাল কাপড়ের প্রয়োজনকেও এড়িয়ে যাওয়া হয়। শিশুরা শিক্ষার কোন সুযোগ পায় না। তাদেরকে অল্প বয়স থেকেই কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত করা হয়। ফলে শিশুদের প্রতিপালনে পরিবারের ব্যয় অত্যন্ত কম হয় এবং তাদেরকে বোঝা হিসেবে বিবেচনা না করে অধিক আয়ের হাতিয়ার হিসেবে দেখা হয়। এভাবে শিশু প্রতিপালনের ব্যয়ভার স্বল্প হওয়ায় প্রজনন হার বৃদ্ধি পায়।

১০. উচ্চ শিশু মৃত্যুহারঃ বাংলাদেশে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, রোগব্যাধি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ইত্যাদি কারণে প্রতি বছর প্রচুর শিশু অকালে মৃত্যুবরন করে। এই মৃত্যুহার জনগণকে অধিক সন্তান গ্রহনে উৎসাহিত করে। বিশেষ করে অশিক্ষিত জনগণ শিশু মৃত্যুর কারণে কম সন্তান জন্মদানকে ভবিষ্যতের জন্য ঝুঁকি মনে করে। এজন্য অশিক্ষিত পরিবারগুলো অধিক সন্তানের জন্ম

দেয় যেন দু'একটি শিশুর মৃত্যু হলেও বাকিরা বেঁচে থাকে। এভাবে অধিক শিশু মৃত্যুহার উচ্চ প্রজনন হারের সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

১১. উচ্চ জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যাশাহীনতা: বাংলাদেশের জনগণ নিম্ন অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে ভবিষ্যত অপেক্ষা বর্তমানের সাথে বেশি সম্পর্কিত থাকে। অধিকাংশ সাধারণ মানুষ সৃষ্টিকর্তার উপর ভরসা রেখে জীবন নির্বাহ করে। তারা সব কিছুকেই সৃস্টিকর্তার বিধান হিসেবে মেনে নেয়। এমনকি প্রতি বছর সন্তান জন্ম দিয়ে তারা এটাকেও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা হিসেবে চাপিয়ে দেয়। তারা জানে না তাদের জীবনের কি অধঃপতন হচ্ছে। অধিক সন্তান প্রজননের জন্য তাদের কোন দুঃখ নেই। এ কারণে বাংলাদেশে প্রজনন হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই চলছে।

১২. পারিবারিক বন্ধন: বাংলাদেশে শক্ত পারিবারিক বন্ধন উচ্চ জন্মহারের অন্যতম কারণ। এদেশে তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আবার বিবাহের পর স্ত্রী ছেড়ে কেউ সাধারণত দূরে যেতে চায় না। ফলে স্বামীর অনুপস্থিতির হারও কম। মহিলাদের সন্তান ধারণকালীন সময়ে স্বামী কাছে থাকায় সন্তান জন্মদান বেশি হয়।

১৩. শিল্পায়ন ও শহরায়নের ধীর গতি: বাংলাদেশে শহরায়নের মাত্রা আপেক্ষিকভাবে বেশ নিম্নমানের। মোট জনসংখ্যার ১০% শহরে বাস করে। এদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই হলো অশিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত। শহরের উপকণ্ঠে গড়ে উঠেছে শত শত বস্তি। এসব বস্তিতে বসবাসকরী স্বল্প আয়ের মানুষজন মনে করে অতিরিক্ত সন্তান জন্ম দিলে অধিক আয় হবে যা তাদের দারিদ্র দূর করবে। কিন্তু হয় তার বিপরীত। ফলে প্রজনন সমস্যা প্রকট আকার ধারন করে।

১৪. দ্রুত সন্তান জন্মদান প্রবণতা: বালাদেশে সামাজিক মূল্যবোধ এমন যে বিবাহের পর কোন পরিবারে সন্তান জন্মাদানে বিলম্ব হলে স্ত্রীকে সন্তান জন্মদানে অক্ষম বলে বিবেচনা করা হয়। এই কারণে অশিক্ষিত এবং এমনকি শিক্ষিত নারীদের মধ্যে বিবাহের পর যথাশীঘ্র প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান জন্মাদানের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথম ও দ্বিতীয় সন্তান যদি কন্যা শিশু হয় তবে এজন্য মহিলাদেরকেই দোষারোপ করা হয় এবং ছেলে সন্তানের আশায় বারবার সন্তান জন্মদান চলতেই থাকে। সন্তান জন্মদানের এই প্রবণতা নিশ্চিতভাবেই প্রজনন হার বৃদ্ধি করছে বলা যায়।

১৫. অল্প বয়সে বিবাহ: বাংলাদেশের আবহাওয়া এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে মেয়েরা অল্প বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হয় এবং তাদের প্রজনন শক্তি সৃষ্টি হয়। এদেশের মেয়েদের বিবাহের জন্য উপযুক্ত বয়স ১৭-১৮ বছর। শতকরা ৯৫ জন মেয়ের বয়স ত্রিশ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। একবার বিয়ে হয়ে গেলে বিবাহ বিচ্ছেদ, তালাক, দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা এবং মৃত্যু ব্যতীত স্বামী-স্ত্রী একত্রেই বসবাস করে। বিবাহের পর অধিকাংশ মহিলাই ঘরেই বাস করে এবং সন্তান জন্মদানের চিন্তা করে। এভাবে প্রজনন হার বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(গ) অর্থনৈতিক কারণসমূহ

১. অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও বেকারত্ব: বাংলাদেশে উচ্চ প্রজননের অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা ও বেকারত্ব। এদেশের অধিকাংশ কর্মক্ষম মানুষ দরিদ্র ও বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত। তাদের কোন অর্থনেতিক নিরাপত্তা নেই। জনবিজ্ঞানীদের মতে, Poverty and fecundity go together। অর্থাৎ দারিদ্র ও প্রজনন ক্ষমতা একত্রে অগ্রসর হয়। তাছাড়া কৃষি প্রধান অর্থনীতি, মহিলাদের স্বল্প কর্মসংস্থান, কৃষি ও মৌসুমী শিল্পে বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদিও অধিক প্রজনন হারের সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

২. কৃষি প্রধান অর্থনীতি: বাংলাদেশের প্রধান পেশা কৃষি। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট। এ পেশার জন্য প্রান্তিক শ্রমশক্তি স্বাগতিক ও সনাতন ধরনের। তাই কৃষক পরিবারে অধিক সন্তান মানেই কৃষিকাজে অধিক শ্রমিকের ব্যবহার। তারা ছেলে সন্তান কামনা করে প্রজনন হার বৃদ্ধি করে থাকে।অধিক ছেলে সন্তান হলে তারা বাহির থেকে শ্রমিক না নিয়ে পরিবারের সদস্য দিয়েই কৃষি কাজ পরিচালনা করে। এতে খরচ কমে যায়

এবং কৃষি থেকে লাভবান হওয়া যায়। এজন্য জন্মের পর ছেলে হলে তারা উল্লাস প্রকাশ করে। এতে সঙ্গত কারণেই প্রজনন হার বৃদ্ধি পায়।

৩. ছেলে সন্তানদের অর্থনৈতিক মূল্য: অর্থনৈতিক কারণে বাংলাদেশের গ্রামীণ অঞ্চলে বিশেষকরে দরিদ্র পরিবারে ছেলে সন্তানের চাহিদা বেশি থাকে। দরিদ্র পরিবারে ছেলে সন্তানকে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা এবং অর্থ উপার্জনের উপায় হিসেবে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়। এজন্য একের পর এক কন্যা সন্তান জন্ম নিলেও পিতামাতা পুত্র সন্তানের আশায় প্রজনন হার বৃদ্ধি করেই চলে। জনবিজ্ঞানী Mead Cain এবং Samuel S. Lieberman তাদের "Development policy and the projects of Fertility Decline in Bangladesh" নামক একটি গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন যে, বাংলদেশের গ্রামাঞ্চলে পুত্র সন্তানকে ভবিষ্যত আর্থিক নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই মনোভাবকে উচ্চ জন্মহারের অন্যতম প্রধান কারণ বলা হয়।

৪. মহিলাদের স্বল্প কর্মসংস্থান সুযোগ: বিভিন্ন জরীপ এবং গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিবারের বাহিরে মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হলে প্রজনন হার আশানুরুপ হ্রাস পায়। বাংলাদেশে নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম। আর শিক্ষিত হলেও প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় না। ১৯৯২ সালে Dr. M.A Mabub পরিচালিত Bangladesh's Population Problem and Programme Dynamics নামক এক গবেষণা জরীপ থেকে দেখা যায় যে, শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের হার যাই হোক না কেন, যে সব মহিলা গৃহস্থালী কর্মে নিযুক্ত থাকে তাদের প্রজনন হার বাহিরে কার্যরত মহিলাদের প্রজনন হারের তুলনায় অনেক বেশি হয়। বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক এবং ধর্মীয় কারণে মহিলাদের পরিবারের বাহিরে কাজের সুযোগ খুব কম থাকে। ফলে তাদের প্রজনন হার উচ্চ হয়।

৫. নিম্ন জীবনযাত্রার মান: বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের নিম্ন জীবনযাত্রার মান ক্রমাগতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে চলেছে। নিম্ন জীবন যাত্রা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে তারা অধিক পুত্র সন্তান কামনা করে। এজন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠী জন্মনিয়ন্ত্রণে আগ্রহী নয়। তারা সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধিকে বিশেষ করে পুত্র সন্তান বৃদ্ধিকে অধিক আয়ের পথ বলে বিবেচনা করে। এজন্য প্রতি বছর তারা সন্তান জন্মদান করে এবং ছেলে সন্তান একটু বড় হলেই তাদেরকে কোন কাজে নিয়োজিত করে। তাদের এ মনোভাবের ফলে প্রজনন হার বৃদ্ধি পায়।

৬. অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা: বাংলাদেশে অতিরিক্ত সন্তানকে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে ভবিষ্যত নিরাপত্তার ভিত্তি বিবেচনা করা হয়। অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে দরিদ্র শ্রেণির মানুষ সন্তান সংখ্যা বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হয়। কারণ দরিদ্র পরিবারের উপার্জনের জন্য সদস্যদের শ্রম ব্যতীত অন্যকোন অর্থনৈতিক সম্পদ নেই। তাই তারা অতিরিক্ত সন্তানের ভবিষ্যত শ্রমকে অতিরিক্ত উপার্জনের উৎস বলে মনে করে। এজন্য তারা অধিক সন্তান জন্মদানে উৎসাহী হয় এবং প্রজনন হার বৃদ্ধি করে চলে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সে দেশের জনগোষ্ঠী একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বাংলাদেশেও এরূপ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে জনসংখ্যা এদেশের জন্য একটি আপদে পরিণত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলে আঘাত হানায় রাষ্ট্রীয়ভাবে এটিকে এক নম্বর জাতীয় সমস্যা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। আমাদের ১,৪৮,৩৯৩ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দেশে বর্তমানে (২০০২) সালে প্রায় ১৩.১২ কোটি লোকের বসবাস ছিল। এত বেশি লোকের কর্মসংস্থানের জন্য দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ শিল্প কারখানা ও ব্যবসা বাণিজ্য সহ অর্থনীতির বিকাশ ঘটেনি। এছাড়া এখানে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের পরিমাণও খুব সীমিত। জনসংখ্যা ১.৪৮ শতাংশ হারে বৃদ্ধি অব্যাহত থাকলে পরবর্তী ৩২ বছরের কম সময়ে জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণে পরিণত হবে। এরূপ অবস্থা জাতির জন্য নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। বাংলাদেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীকে নিম্নলিখিত দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিবেচনা করলে নির্দ্বিধায় এটি একটি জটিল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা যায়।

১. খাদ্যের উপর চাপ সৃষ্টিঃ দেশের মোট খাদ্য উপাদান দ্বারা ১৩.১২ কোটি লোকের অন্নসংস্থান করা একটি কঠিন বিষয়। খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা। সরকার খাদ্য ঘাটতির মোকাবেলার জন্য বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করে থাকে। ইতোমধ্যে দেশে বেশি খাদ্য ফলানোর জন্য সরকারিভাবে কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। এতে উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় তার পরিমাণ এখনো অপ্রতুল। বর্ধিত জনসংখ্যা খাদ্যের উপর ভাগ বসানোর ফলে খাদ্য বন্টনের হার ক্রমে কমে আসছে। তাই চাহিদার ঘাটতি পূরণের জন্য গড়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫লাখ টন খাদ্য বিদেশ হতে আমদানি করা হয়।

২. মূলধন গঠনঃ উন্নয়নের জন্য মূলধন অপরিহার্য। বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি। তাই আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণও কম। ২০০১-০২ সালে এর পরিমাণ ছিল ২২.৪৩%। দেশের ব্যাংক বীমাসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ের জন্য যে পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করা হয় তা চাহিদার তুলনায় সামান্য। এ কারণে আমাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে না।

৩. কৃষি জমির উপর চাপঃ বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৬২.৩ জন লোক সরাসরি কৃষির উপর নির্ভরশীল। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মোট আবাদী জমির উপর প্রচন্ড চাপ সৃস্টি হয়েছে। গ্রামে কৃষি ব্যতীত বিকল্প কর্মসংস্থানের সীমিত ব্যবস্থায়ই বর্ধিত যুব সমাজের অধিকাংশই কৃষি জমিতে ভীড় জমাতে শুরু করেছে। এতে দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি জোতসমূহ দিন দিন ছোট থেকে আরো ছোট হচ্ছে।

৪. ভূমিহীনের সংখ্যা বৃদ্ধিঃ দেশে কর্মসংস্থানের প্রসার না ঘটায় অধিকাংশ পরিবারে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেঁচে থাকার জন্য এ সকল বেকার লোক তাদের সামান্য সহায় সম্পদ বিক্রি করে ধীরে ধীরে ভূমিহীন দরিদ্র লোকে পরিণত হয়।

৫. বেকার সমস্যাঃ আমাদের অর্থনৈতিক অবকাঠামো তেমন মজবুত নয়। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের ফলে সামান্য কিছু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হলেও চাহিদার তুলনায় তা কম। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অংশ কিশোর তরুণদের কাতারে সামিল হয়ে শ্রমমক্তি বিনিয়োগের জন্য প্রস্তুত হয়। এ জন্যই বেকারের পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

৬. বন্টনঃ মানুষের মৌলিক চাহিদার উপকরণ বন্টনে মাথাপিছু হার এতই কম থাকে যে, যা দ্বারা নিম্নতম চাহিদা পূরণ হয় না। সে কারণেই মানুষ অপুষ্টি, অন্ধত্ব ও নান জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। সরকারী প্রচেষ্টায় রোগ নিরাময়ের জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা নেয়া হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়।

৭. বর্ধিত জনগোষ্ঠীর ভরন পোষণঃ প্রতি বছর বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তার ভরণপোষণের জন্য স্বাভাবিক চাহিদার চেয়ে অতিরিক্ত ৩লক্ষ ৫০ হাজার টন খাদ্য, ২লক্ষ ৮১ হাজার বাসগৃহ এবং ৭ লক্ষ ৫০ হাজার লোকের কর্মসংস্থানের প্রয়োজন । দেশে শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য বর্ধিত জনসংখ্যার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা উচিত। তা ছাড়া আরও প্রায় ৭ লক্ষ ৩৬ হাজার স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ২৩ হাজার প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্কুল প্রয়োজন। ২০০৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান সুবিধাদি এ বর্ধিত প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল।

৮. নির্ভরশীলতার হার বৃদ্ধিঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয় কারণ ছাড়াও সামাজিক, বয়স ও রোগজনিত কারণে দেশের মোট জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশের উন্নয়ন কাজে যথাযথ ভূমিকা নেই বললেই চলে। দেশে একটি সুষ্ঠু অর্থনীতি গড়ে তোলার পথে এটিও একটি অন্তরায়। এক হিসাবে দেখাযায় মাত্র ৬.৩ কোটি পুরুষ ও নারী কাজ করে, আর ৭.০৯ কোটি পোষ্য বসে বসে খায়। এই কর্মী সংখ্যার মধ্যে ১ কোটি ৫০ লক্ষ কর্মী শহরে এবং ৪ কোটি ৮০লক্ষ কর্মী গ্রামে বাস করে।

৯. শিল্প উন্নয়নে বাধাঃ দেশকে শিল্পে সমৃদ্ধ করার জন্য বিপুল পরিমাণ পুঁজির প্রয়োজন। পুঁজি গঠনের জন্য সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আমাদের দেশে সমস্যা অনেক। মানুষের মৌলিক চাহিদার বেশির ভাগ অপূর্ণ রাখা গেলেও খাদ্য চাহিদাকে তাৎক্ষনিক ভাবে পূরণ করতে হয়। বর্তমানে কৃষি উৎপাদন দ্বারা মোট জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণ সম্ভব নয়। তাই সরকারকে প্রতি বছর বিদেশ থেকে নগদ মূল্যে অথবা ঋণের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করতে হয়।

এতে সরকারের হাতে নগদ অর্থ সঞ্চয় হতে পারে না। তাই উন্নয়নকে গতিময় ও বিকেন্দ্রীকরণের জন্য শিল্প কারখানার প্রসার ঘটানো সম্ভব হয় না।

১০. সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধির প্রবণতা: মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাই সামাজিক জীবনে অপরাধ বৃদ্ধির মূল কারণ। যুব সমাজের চাকুরী, আর্থিক অসচ্ছলতা ও বিদ্যা শিক্ষার অপূর্ণতা থেকেই অপরাধ প্রবণতা জন্ম নেয়। এ জাতীয় অবক্ষয় রোধের বিষয়ে সরকার এবং সমাজপতিদের সব সময়ই প্রস্তুত থাকতে হয়। তারা অগ্রগতির চেয়ে সমাজের অপরাধ নিবারণে নিয়োজিত বলেই দেশের উন্নয়ন কাজ আরও পিছিয়ে যাচ্ছে।

১১. নতুন বসতি স্থাপন: জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কৃষি ভূমি বিনষ্ট হয়ে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস এবং অন্যান্য সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	
শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে এবং এর প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।	

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা একটি জাতীয় অর্থনৈতিক সমস্যা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বহু সামাজিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। Geography of Hunger বইটি কার লেখা?

ক) D. Castro খ) J.S. Miu গ) Aristotle ঘ) Nelson Mendela

২। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কত ভাগ শহরে বাস করে?

ক) ২০ ভাগ খ) ১৫ ভাগ গ) ২৫ ভাগ ঘ) ১০ ভাগ

৩। বাংলাদেশে গড়ে প্রতি বছর কি পরিমাণ খাদ্য আমদানী করতে হয়?

ক) ১৫-২০ লক্ষ মে.টন খ) ২০-২৫ লক্ষ মে.টন গ) ৩০-৩৫ লক্ষ মে.টন ঘ) ১০-১৫ লক্ষ মে.টন

পাঠ ৪.৩ জনসংখ্যা তত্ত্ব
Population Theory

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে জনসংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাপের মধ্যে সম্পর্ক দেখাতে পারবেন।

মূলপাঠ

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

জনসংখ্যার সর্বাধিক পরিচিত তত্ত্ব হল- ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ধর্মযাজক ও প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ টমাস রবার্ট ম্যালথাস (Thoma Robert Malthus) তাঁর "Essay on the principles of Population" নামক বইয়ে জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি তত্ত্ব প্রচার করেন। তত্ত্বটি তার নাম অনুসারে "ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

ম্যালথাসের মতে, মানুষের অস্তিতের জন্য খাদ্য অত্যাবশ্যক হলেও তা জনসংখ্যা বাড়ার তুলনায় কম হারে বাড়ে। তাঁর মতে মানুষের অতি-প্রজনন ক্ষমতার জন্য জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ে এবং তার ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করলে প্রতি পঁচিশ বছরে একটি দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। কিন্তু জমির যোগান সীমিত এবং সেখানে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি তাড়াতাড়ি কার্যকর হয় বলে খাদ্যোৎপাদন জনসংখ্যার চেয়ে অনেক ধীরে বাড়ে।

তাঁর মতে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতিতে, যেমন, ১, ২, ৪, ৮, ১৬, ৩২ ইত্যাদি গুণনের নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যার ধারায় এবং খাদ্যোৎপাদন বাড়ে গাণিতিক প্রগতিতে, যেমন, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ ইত্যাদি যোগের নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সংখ্যার ধারায়। গাণিতিক প্রগতির তুলনায় জ্যামিতিক প্রগতি দ্রুত বাড়ে বলে জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদনের চেয়ে বেশি হারে বাড়ে। এ দুই অসম শক্তির ক্রিয়ার ধারা অব্যাহত থাকলে এমন এক সময় আসে যখন দেশের জনসংখ্যা ও খাদ্য উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হয়। এ অবস্থায় দেশে খাদ্য ঘাটতি বা খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। এ পরিস্থিতিকে জনাধিক্যের লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ম্যালথাসের মতে, দুই উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা যায়;
যথা- (ক) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা (খ) প্রাকৃতিক নিরোধ ।

(ক) প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা: বিলম্বে বিবাহ, বিবাহিত জীবনে সংযম, প্রয়োজনবোধে কৌমার্য অবলম্বন ইত্যাদি জন্মনিয়ন্ত্রণের নৈতিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ ব্যবস্থা বলা হয়। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে জন্মহার কমিয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়।

(খ) প্রাকৃতিক নিরোধ: অতিরিক্ত দারিদ্র্য, অপুষ্টি, অস্বাস্থ্যকর পেশা, অত্যাধিক পরিশ্রম, নৈসর্গিক প্রতিকূলতা, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি বিপর্যয়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ হলে প্রাকৃতিক নিরোধ কার্যকর হয় এবং এক সময়ে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি 'ম্যালথাসীয় চক্র'- এর সাহায্যে দেখানো হলো: পাশে জনসংখ্যা সম্পর্কীত যে ম্যালথাসীয় চক্র দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায়, প্রথমে খাদ্য ও জনসংখ্যার মধ্যে
ভারসাম্য বজায় থাকে। কিন্তু জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদনের চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় অচিরেই এ ভারসাম্য বিনষ্ট হয়;
ফলে জনাধিক্য দেখা দেয়।
এ অবস্থায় আবার প্রাকৃতিক নিরোধ কার্যকরী হয় এবং বাড়তি জনসংখ্যাকে নিশ্চিহ্ন করে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য অবস্থা ফিরিয়ে আনে।
ম্যালথাসের মতে, প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণের দ্বারা জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে যে ভারসাম্য স্থাপিত হয় তা নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে বার বার এ বেদানাদায়ক ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে। তাই তিনি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

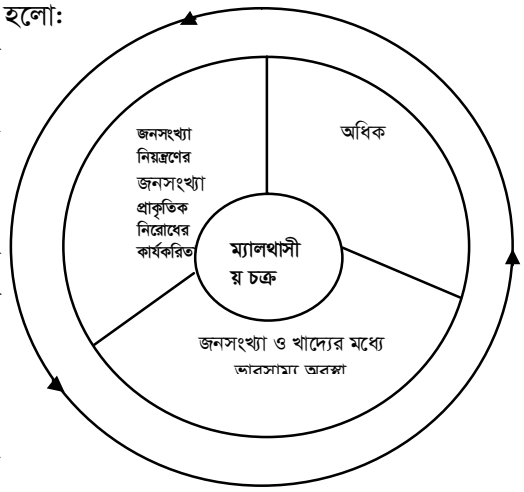

চিত্র: জনসংখ্যার ম্যালথাসীয় চক্র ।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা:

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি পরবর্তীকালে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এ তত্ত্বের প্রধান সমালোচনাগুলো নিম্নরূপ:

১। মিথ্যা ভবিষ্যদ্বাণী: ম্যালথাস যেরূপ আশঙ্কা করেছিলেন, ম্যালথাস- পরবর্তীকালে পশ্চিমা দেশগুলোতে জনসংখ্যা তত দ্রুত বাড়েনি। বৈষয়িক সমৃদ্ধি অর্জনের দরুন জীবনযাত্রার মান আগের চেয়ে উন্নত হওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক কমে যায়।

২। জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে বাড়ে না: ম্যালথাসের মতে, জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতিতে। কিন্তু বর্তমানে উন্নত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে জন্ম - শাসনের প্রবণতা থাকায় জনসংখ্যা ধীর গতিতে বাড়ে।

৩। খাদ্যোৎপাদন গাণিতিক প্রগতির চেয়ে দ্রুত বাড়ে: আধুনিককালে উন্নত প্রযুক্তি এবং আধুনিক কৃষি - উপকরণগুলো ব্যবহারের ফলে খাদ্যোৎপাদন দ্রুত বাড়ে। ফলে জনসংখ্যা ও খাদ্যোৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য সহজে নষ্ট হয় না।

৪। জনসংখ্যাকে সামগ্রিক সম্পদের সাথে তুলনা করা হয়নি: ম্যালথাস কেবল খাদ্যোৎপাদনের বিষয় বিবেচনা করেছেন, জনসংখ্যার সাথে দেশের মোট সম্পদের তুলনা করেননি। প্রকৃতপক্ষে বৃটেনসহ কয়েকটি শিল্পোন্নত দেশ তাদের শিল্পজাত দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করে খাদ্য সমস্যা দূর করে।

৫। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সব সময়ই খারাপ নয়: ম্যালথাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির শুধু ভয়াবহ দিকটিই বিবেচনা করেছেন, ভাল দিকটি সম্পর্কে তিনি ভাবেননি। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের যোগানও বাড়ে।

৬। জনসংখ্যা নয় বরং সম্পদের অসম বন্টনই সমস্যা: জনসংখ্যা বৃদ্ধি সব সময়ই সমস্যা সৃষ্টি করে না। জনসংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি ও সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করলে জনাধিক্যজনিত সমস্যা এড়ানো যায়।

৭। জনসংখ্যার গুনগত দিক উপেক্ষিত: ম্যালথাস জনসংখ্যার কেবল পরিমানগত দিক বিবেচনা করেছেন; গুণগত দিক গ্রাহ্য করেননি। প্রকৃতপক্ষে, একটি নির্দিষ্ট জনসংখ্যা যদি শিক্ষিত, কর্মঠ, উদ্যোগী এবং উৎপাদনক্ষম হয়, তবে তা দেশের জন্য বোঝা না হয়ে সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

৮। মৃত্যুহার হ্রাসের ফলেই জনসংখ্যা বেশি হয়ে পড়ে: চিকিৎসা বিজ্ঞানে অভাবনীয় উন্নতি অনেক মারাত্মক রোগ নিয়ন্ত্রণ করে মানব জীবন দীর্ঘতর করেছে। তাই জনসংখ্যা বাড়ার একমাত্র কারণ জন্মাহার বৃদ্ধি নয় বরং মৃত্যুহার কমাও এর অন্যতম কারণ।

পরিশেষে নানা সমালোচনা সত্ত্বেও বলা যায়, উন্নত দেশগুলোতে না হলেও বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে জন্ম ও মৃত্যুর উচ্চহার, অমানবিক দারিদ্র্য, স্বাভাবিক নিম্ন জীবনযাত্রার মান, বিপুল খাদ্য ঘাটতি, মহামারির পুনরাবৃত্তি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস আমাদেরকে ম্যালথাসবাদের সত্যতা স্মরণ করিয়ে দেয়। জুলিয়ান হাকস্‌লি এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সম্পূর্ণ অভ্রান্ত ও ব্যতিক্রমবিহীন বলে প্রমাণিত না হলেও মূলত এটি যে সত্য তা বর্তমানে স্বীকৃত।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বঃ

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অধ্যাপক এডউইন ক্যানান, কার সান্ডার্স, ডালটন, রবিন্‌স প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের একটি বিকল্প তত্ত্ব প্রচার করেন। এটি কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব নামে পরিচিত। এ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে জনসংখ্যা বর্তমান থাকলে জনগণের মাথাপিছু দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ বা প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয়, তাকে কাম্য জনসংখ্যা বলে। অর্থনীতিবিদ ডালটন বলেন, "কাম্য জনসংখ্যা হল তা যা সর্বাধিক মাথাপিছু আয় প্রদান করে।"

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব অনুসারে কোন দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগানোর জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন হয়। একেই কাম্য জনসংখ্যা বলে। যদি কোন দেশের প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে কম হয় তাকে নিম্ন জনসংখ্যা বলে। জনসংখ্যার এ আয়তন প্রাপ্ত সম্পদের পূর্ণ ব্যবহারের জন্য অপ্রতুল হয় এবং এ অবস্থায় শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণের সুবিধাগুলো বিশেষভাবে কাজে লাগানো যায় না। তাই, প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয় না। এ অবস্থায় জনসংখ্যা বাড়ার ফলে শ্রমের যোগান বাড়ে। শ্রমবিভাগ ও উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশলের ব্যবহার ঘটে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয়। এর ফলে উৎপাদন ও মাথাপিছু প্রকৃত আয় বাড়ে। অবশেষে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে তা কাম্য আয়তনের চেয়ে বেশি হলে জনসংখ্যার তুলনায় উৎপাদন ও সম্পদ কম হারে বাড়ে। ফলে মাথাপিছু আয় ক্রমশ কমে যায়। এ পর্যায়ের জনসংখ্যাকে অতিরিক্ত জনসংখ্যা বলা হয়।

তাই দেখা যায়, নিম্ন অথবা অধিক জনসংখ্যা কোনটিই বাঞ্চনীয় নয়। কেবল জনসংখ্যার যে আয়তনে মাথাপিছু প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয়, তাই হল কাম্য জনসংখ্যা। স্বভাবতই কাম্য সংখ্যা কোন স্থির বা নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়, বরং এটি পরিবর্তনশীল। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, পুঁজি, উৎপাদন পদ্ধতি, সংগঠন ইত্যাদি পরিবর্তনের সাথে এ সংখ্যার নিয়ত পরিবর্তন ঘটে। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বকে নিচের রেখাচিত্রের সাহায্যেও বোঝানো যায়:

চিত্রে OX-অক্ষে জনসংখ্যা এবং OY-অক্ষে মাথাপিছু প্রকৃত আয় নির্দেশিত হয়েছে।
RQP - হল মাথাপিছু প্রকৃত আয় রেখা।
চিত্র থেকে বোঝা যায়, জনসংখ্যার আয়তন শূন্য (০) থেকে বেড়ে OM- স্তরে পৌছা পর্যন্ত মাথাপিছু প্রকৃত আয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। OM- স্তরে জনসংখ্যার মাথাপিছু প্রকৃত আয় সর্বাধিক হয়ে QM- তে দাঁড়ায়।
সুতরাং OM জনসংখ্যাই হল কাম্য জনসংখ্যা। OM-এর পরে জনসংখ্যা আরও বাড়লে মাথাপিছু আয় কমে যায়। জনসংখ্যার আয়তন OM -এর চেয়ে কম হলে নিম্ন জনসংখ্যা এবং বেশি হলে অধিক জনসংখ্যা বোঝায়।

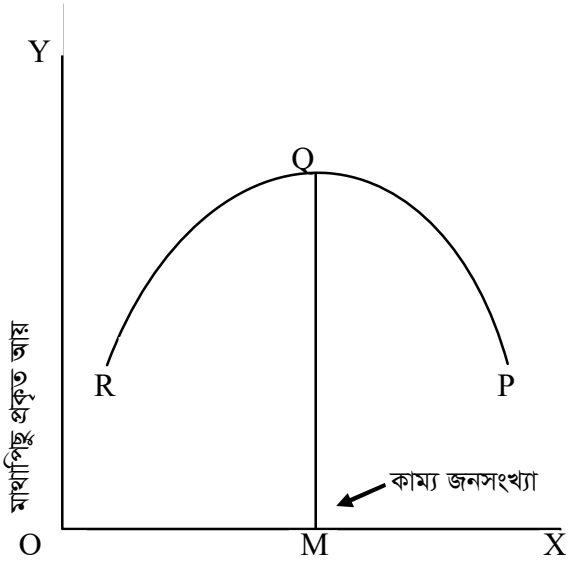

চিত্র- জনসংখ্যার আয়তন

কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের সুক্ষ্ম মাপকাঠি নেই। তবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো কাম্য জনসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিচার করা হয়–

১। পূর্ণ কর্মসংস্থান;
২। সর্বাধিক আয় ও উন্নত জীবনযাত্রা;
৩। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম;
৪। সম্পদের সদ্ব্যবহারের উপযোগী ইত্যাদি।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমালোচনা:

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি ত্রুটিমুক্ত নয়। নিচে তত্ত্বটির ত্রুটিগুলো আলোচনা করা হল:

১। কাম্য সংখ্যা নির্ণয় অসুবিধাজনক: তত্ত্বটি দ্বারা কোন দেশের কাম্য জনসংখ্যার আয়তন নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব। কারণ, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধন, কারিগরি জ্ঞান, উৎপাদন প্রভৃতির সর্বদাই পরিবর্তন ঘটায় কাম্য জনসংখ্যার আয়তনও সর্বদা পরিবর্তিত হয়।

২। মৌলিক তত্ত্বের অভাব: কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বে জনসংখ্যা সম্পর্কে কোন তত্ত্বমূলক ধারণা পাওয়া যায় না। তত্ত্বটিতে কোন দেশের জনসংখ্যা বাড়া বা কমার প্রবণতা, কারণ ও ফলাফল, জন্ম ও মৃত্যুর হার কমা প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন আলোচনা স্থান পায়নি।

৩। বাস্তব অবস্থা বিশ্লেষণে অসমর্থ: এ তত্ত্বে জনসংখ্যার আয়তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জনসংখ্যা গঠন ও দক্ষতা, তার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ের ওপর কোন আলোকপাত করা হয়নি।

৪। মাথাপিছু আয়ের সঠিক পরিমাপ অসম্ভব: কোন দেশে মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তন পরিমাপ করা বেশ কঠিন। কারণ, মাথাপিছু আয়ের উপাত্ত প্রায়ই ভুল, বিভ্রান্তিকর এবং অনির্ভরযোগ্য হয়।

উপসংহার: কিছু দোষ-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অকেজো বা মূল্যহীন হয়ে পড়েনি। তত্ত্বটি আমাদেরকে ম্যালথাসীয় তত্ত্বের হতাশাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত করেছে। যদি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সাথে উৎপাদন বৃদ্ধিও চলতে থাকে তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের আলোকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা:

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রযোজ্যতা এর অনুমিতিসমূহের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

১. মোট জনসংখ্যা এবং মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার স্থির অনুপাত:

বাংলাদেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও মোট জনসংখ্যা এবং মোট কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাত স্থির অবস্থায় রয়েছে। কারন এদেশে প্রতিবছর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মক্ষম জনসংখ্যাও সমান হারে বৃদ্ধি পায়। তবে এই বৃদ্ধির হার সবসময় এক রকম থাকে না। বর্তমানে কৃষিখাতে গড় উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষি শ্রমিকের গড় আয়ও ক্রমশ বাড়ছে। এদিক থেকে বলা যায় কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্ব বাংলাদেশে আংশিকভাবে প্রযোজ্য।

২. অপরিবর্তনীয় মূলধন এবং উৎপাদন কৌশল:

বাংলদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মূলধন এবং উৎপাদনক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, শিল্প এবং কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। কৃষি ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করায় উৎপাদন পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একই কথা শিল্প ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের এই অনুমিতিটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৩. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি:

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক খাত যেমন কৃষি, মৎস্য, খনি ইত্যাদি খাতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির যথার্থতা পরিলক্ষিত হয়। প্রাকৃতিক খাত থেকে যতই মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় প্রান্তিক উৎপাদন ততই কমতে থাকে। এক সময় কমতে কমতে তা ঋণাত্মকও হতে পারে। তাই বলা যায়, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের এই অনুমিতিটি বাংলদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৪. কর্মক্ষম জনসংখ্যার স্থির শ্রম ঘন্টা:

বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও শ্রম ঘন্টার কোন পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পূর্বে যে পরিমান শ্রম ঘন্টা ব্যয় করতো, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার পরেও সেই একই পরিমান শ্রম ঘন্টা ব্যয় করে। উদাহরণ হিসেবে

বাংলাদেশের সরকারী অফিসের সময়সূচীর উল্লেখ করা যায়। যা সকাল নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কার্যকর। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সরকারী অীফসের সময়সূচীর কোন পরিবর্তন হয় না।

৫. স্থির প্রাকৃতিক সম্পদঃ

বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য অনুসন্ধান চলছে। একসময় এদেশে গ্যাসও আবিষ্কৃত ছিল না। অথচ এখন গ্যাস, কয়লা, তেল আমাদের দেশের অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বিভিন্ন অনুসন্ধানের মাধ্যমে নিত্য নতুন প্রাকৃতিক সম্পদের খোজ পাওয়া যাচ্ছে। এদিক থেকেও কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের এ অনুমিতিটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়।

বাংলাদেশের প্রকৃতিক সম্পদ, জীবযাত্রার মান, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্মসংস্থান, জনগনের কর্মস্পৃহা, আয়ুষ্কাল, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করলে বলা যায় বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই কাম্য জনসংখ্যা অতিক্রম করে ফেলেছে। এদেশে এখন বিরাজ করছে অতি জনসংখ্যা। এদিক থেকে বলা যায়, কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি বাংলাদেশে আংশিকভাবে প্রযোজ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি পড়বেন ও লিখবেন। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে ম্যালথাসের তত্ত্বটির তুলনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

- ম্যালথাসের মতে, একটি দেশে অনিয়ন্ত্রিতভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে প্রতি ২৫ বছরে ঐ দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুন হবে।
- জনসংখ্যা বাড়ে জ্যামিতিক প্রগতিতে আর খাদ্যোৎপাদন বাড়ে গাণিতিক প্রগতিতে।
- বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাম্য ব্যয় অতিক্রম করে এখন অতি জনসংখ্যায় পরিণত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
ক) ১৭৯৫ খ) ১৭৯০ গ) ১৭৯৮ ঘ) ১৮৯৮

২। কোনটি গাণিতিক প্রগতি?
ক) ১,৩,৫,৮ খ) ১,২,৩,৪ গ) ১,২,৪,৮ ঘ) ২,৪,৬,৮

৩। কোনটি জ্যামিতিক প্রগতি?
ক) ১,২,৩,৪ খ) ২,৪,৬,৮ গ) ১,২,৪,৮ ঘ) ১,৩,৫,৮

৪। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সাথে কোন নামটি সম্পর্কযুক্ত?
ক) ম্যালথাস খ) এডাম স্মীথ গ) ডালটন ঘ) পিগু।

পাঠ ৪.৪ বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিশ্লেষণ
Structural Analysis of Population in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতির সার্বিক তথ্য জানতে পারবেন।

মূলপাঠ

যে কোন দেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিভাজন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে দক্ষ-অদক্ষ, ধর্ম, শিক্ষা, বয়স, লিঙ্গ নির্ভরশীলের সংখ্যা, বেকার, মাইগ্রেশন, ভূমিহীন, নদীভাঙ্গন এরকম নানান শ্রেণিতে জনগণের বিভাজন রয়েছে। এসবের সমন্বয় ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাই দেশের সামষ্টিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে। নিচে বাংলাদেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত বিভাজন উল্লেখ করা হল:

১. **দেশের ভৌগলিক অনুপাতে:** বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। এ স্বল্প আয়তনের ভূখন্ডে জনসংখ্যা অনেক বেশি। বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্যমতে জনসংখ্যার আকার প্রায় ১৬.১০ কোটি উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩ অনুযায়ী ২০১২-১৩ সালের সাময়িক প্রাক্কলিত জনসংখ্যার পরিমাণ ১৫ কোটি ৩৬ লাখ দেখানো আছে। হিসেব যাই হোক না কেন, যে কোনো বিবেচনায় এ পরিমাণ জনসংখ্যা ছোট আয়তনের বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই বেশি।

২. **জনসংখ্যার ঘনত্ব :** লোকসংখ্যার ঘনত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালে এ সংখ্যা প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০৩৬ জন বলে উল্লেখ আছে। শহর অঞ্চলে নাগরিক সুবিধা বেশি এবং উন্নত লেখাপড়ার তাগিদে গ্রামের লোকজন শহরমুখী হয়েছে। যে কারণে শহরের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জনঘনত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. **গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা বণ্টন:** বাংলাদেশের অনেকগুলো উপজেলা এখন পৌরসভাতে উন্নীত হয়েছে। ইতোমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে ১১টি সিটি কর্পোরেশন। আবার ব্যবসায়িক বিবেচনায়, শিল্পনগরী, বন্দর, পর্যটন কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুবাদে অনেকগুলো স্থানকে পৌরসভায় উন্নীত করা হয়েছে। বেশি নাগরিক সুবিধা প্রাপ্তির জন্য গ্রামের সক্ষম ব্যক্তিরা এখন শহর অভিমুখী। এ কারণেই শহরে বসবাসকারীর সংখ্যা বিগত দশকের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালের হিসেবে শহরে প্রায় ২৮ শতাংশ লোক বাস করে যা দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. **পুরুষ ও নারীর অনুপাত:** জনসংখ্যা বিশ্লেষণে দেখা যায় বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা কিছুটা কম। ২০১৪ সালের প্রাপ্ত তথ্যমতে পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০৩:১০০ বলে উল্লেখ আছে। পূর্ববর্তী বছরে অনুপাতের এ হার ১০৫:১০০ ছিল।

৫. **বয়স অনুপাতে জনসংখ্যা:** ২০১১ সালে পরিচালিত আদমশুমারীর রিপোর্ট মতে ০-১৪ বছর বয়সী জনসংখ্যা ৩৪.৭ শতাংশ। ১৫-৫৯ বছর বয়সী জনসংখ্যা, যা উৎপাদন কাজে সম্পৃক্ত থাকে, এর সংখ্যা ৫৭.৯ শতাংশ। ৬০ বছরের বেশি বয়সী জনসংখ্যা ৭.৪ শতাংশ।

৬. **পেশাভিত্তিক জনসংখ্যার বন্টন:** বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার বেশিরভাগ কৃষি খাতে নিয়োজিত। শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ১৫ বছরের উর্ধ্বে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের প্রায় ৪৫.১ শতাংশ লোক কৃষি খাতের বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। অন্যান্য পেশার মধ্যে বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট খাতে ১৭.৫০ শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ১৩.৩৫ শতাংশ, পরিবহন ও যোগাযোগ ৮.৪৭ শতাংশ, নির্মাণ খাতে ৪.৭৯ শতাংশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনপ্রশাসন খাতে ৪.২৪, পণ্য ও ব্যাক্তিগত সেবাখাতে ৬.২৬ শতাংশ। জনসংখ্যার এই পেশা ভিত্তিক বণ্টন অর্থনীতিকে সচল রাখার কাজে নিয়োজিত।

৭. **ধর্মভিত্তিক বন্টন:** বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী লোকজন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে। জনসংখ্যার বেশি অংশ মুসলিম হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে ভক্তিশ্রদ্ধা। আনুমানিক ৮৯ শতাংশ মানুষ মুসলিম, ১০ ভাগের কাছাকাছি হিন্দু এবং বাকি ১ শতাংশ বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী।

৮. **শিক্ষিতের হার:** স্বাক্ষর জানা লোকের সংখ্যা বাড়লে জাতিকে শিক্ষিত বলা যায় না। একজন লোক সমাজকে জানবে চিনবে, সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হবে, অন্যের উপকারে সচেষ্ট হবে এসকল দায়িত্ববোধ যার মধ্যে থাকে তাকেই শিক্ষিত বলা যায়। অন্য যে বিষয়টি থাকা দরকার তা হলো দক্ষতা বৃদ্ধি। লেখাপড়া, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি একজন লোককে দক্ষ করে তুলতে সাহায্য করে। মূলত এরূপ দক্ষ লোক দ্বারাই অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। সরকারি হিসাবমতে বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ৭১ শতাংশ বলা হলেও অর্থনীতির চালিকাশক্তি হিসেবে দক্ষ লোকের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক কম। অন্য আরেকটি হিসেবে দেখা যায় মোট শিক্ষিতের মধ্যে ৭৫ ভাগই হচ্ছে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। কারিগরি জ্ঞান সমৃদ্ধ লোকজন তৈরিতে বাংলাদেশ এখনও লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনি।

৯. **গড় আয়ুষ্কাল:** পৃথিবীব্যাপী চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটেছে। মানুষ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য ও সুপেয় পানি পান করার ফলে গড় আয়ু পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে। দেশে ২০১৪ সালে মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭০.৭ বছরের মাঝে উঠা-নামা করছে। বেড়ে যাচ্ছে বয়স্ক লোকের সংখ্যা।

উপরের আলোচনায় বাংলাদেশের জনকাঠামোর বিশ্লেষণ করে আমরা স্পষ্টত দেখতে পাই যে, দেশের আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যার চাপ এবং পরিমাণ অনেক বেশি। অর্থনীতিতে ধারণা করার মতো এ সংখ্যাকে যেকোনো বিচারে অতিরিক্ত বলা হবে। বর্গমাইল প্রতি যে পরিমাণ লোক বসবাস করে তার ভরণ-পোষণ কি করে করা যাবে তা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে শিক্ষার হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা গেলেও বিশ্বমানের শিক্ষা প্রদান থেকে দেশ অনেক পিছিয়ে আছে। জনসংখ্যার বন্টন যাই হোক না কেন বিশ্বমানের করে জনশক্তি তৈরি করা না গেলে অচিরেই অর্থনীতির জন্য বিপদ বয়ে আনতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা জনসংখ্যার বিভিন্ন বণ্টন সম্পর্কে জানবেন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশের জনসংখ্যা কাঠামো মূলত আয়তন, ঘনত্ব, বয়স, পেশা, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতি বিভিন্ন মানদন্ডে বণ্টন নির্দেশ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার?
ক) ১৪৪৫৭০ বর্গ কিমি খ) ১৪৩৫৭০ বর্গ কিমি গ) ১৪৭৫৭০ বর্গ কিমি ঘ) ১৪৮৫৭০ বর্গ কিমি

২। ২০১৪ সালের তথ্য মতে বাংলাদেশে নারী-পুরুষ অনুপাত কত ছিল?
ক) ১০০:১০৫ খ) ১০৩:১০০ গ) ১০০:১০৪ ঘ) ১০০:১০২

৩। ২০১৪ সালের তথ্য মতে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে কতজন বসবাস করে?
ক) ১০০০ জন খ) ১০৩০ জন গ) ১০৩৬ জন ঘ) ১০৫০ জন।

পাঠ ৪.৫ বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম
Population Control Programme in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী সমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হল জনসংখ্যা সমস্যা। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস করার জন্য সরকার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচী ও পদক্ষেপগুলোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণও করা হয়েছে। এই কর্মসূচীগুলো সাফল্য ও ব্যর্থতায় মিশ্রিত। নিম্নে বিভিন্ন কার্যক্রমে সরকারের ভূমিকা মূল্যায়ন করা হলো।

১. **প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ব্যবস্থা:** সরকার মাঠ পর্যায়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিদর্শনের নীতিমালা জারী করেছে। এই নীতিমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মা ও শিশুর স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা, স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের তদারকি ও পরিদর্শনের জন্য সুনির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষনা, প্রতিবেদন পেশ করা, ইত্যাদি।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কার্যক্রম সমগ্র দেশব্যাপী পরিচালিত একটি প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, অধিদপ্তর ও মন্ত্রনালয় সংশ্লিষ্ট তাকে। এদের মধ্যে কোন সমন্বয় পরিলক্ষিত হয় না। সমন্বয়হীনতার কারণে কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। এই বিশৃঙ্খলা জনগণের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়।

২. **মাঠ পর্যায়ে সেবা দান কর্মসূচী:** সরকার মাঠপর্যায়ে বিবাহিত দম্পতিদের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে একটি হলো স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রনে তিরিশ হাজার মাঠকর্মীর এক সুবিশাল নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কে অন্তর্ভূক্ত মহিলাদের প্রশিক্ষন দেয়া হচ্ছে যেন তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিবাহিত মহিলাদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে সচেতন করে এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য খাবার বড়ি সরবরাহ করে।

বাস্তবে এই কর্মীবাহিনী ঘরে ঘরে জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা পৌঁছে দিতে যথেষ্ট সক্ষম হয়নি। দেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এই নেটওয়ার্কের কোন সেবা পায়নি। যা কিছু পাওয়া গেছে তা অত্যন্ত অনিয়মিত ও অকার্যকর। এক জরীপে দেখা গেছে, গ্রামের বিবাহিত মহিলারা ছয় মাস কি এক বছরে কদাচিৎ একজন মহিলা পরিবার পরিকল্পনা মাঠ কর্মীর সাক্ষাত পান। এই মাঠ কর্মীরা বিভিন্ন সমস্যার কারণে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনে ব্যর্থ হন। এ সমস্যাগুলোর মধ্যে আছে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, নিয়মিত তদারকি না করা, ইত্যাদি।

৩. **জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণের বিতরণ পদ্ধতি:** বাংলাদেশের গ্রামীন এলাকায় জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী সহজলভ্য করতে সরকার থানা ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে বিনামূল্যে এগুলো বিতরণ করার উদ্যোগ গ্রহন করেছে। এছাড়া থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রগুলি থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ ব্যবহারকারী মহিলাদেরকে I.U.D পদ্ধতি প্রদান করা সহ পর্যায়ক্রমিক জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

সরকারের উপরোক্ত কার্যক্রম মূল্যায়ন করলে দেখা যায়, দেশের প্রায় ১০% থানায় এবং ৪০% ইউনিয়নে কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রই নেই। ফলে এই এলাকার জনগণ সরকারের উপরোক্ত কার্যক্রমের সুবিধা নিতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থ হয়। এছাড়া

যেসকল থানা ও ইউনিয়নে স্বাস্থ্যকেন্দ্র আছে সেগুলোও নানা সমস্যায় জর্জরিত। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির প্রধান সমস্যা ডাক্তারদের কর্মক্ষেত্রে অবস্থান না করা। এছাড়া প্রয়োজনীয় ঔষধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণেরও ঘাটতি দেখা যায়।

৪. **মাঠ পর্যায়ে দায়িত্ব বন্টন:** মাঠ পর্যায়ে একজন কর্মী কতটুকু কাজ করবে তা নির্ধারণ করে দেয়া অত্যন্ত জরুরী।এজন্য থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে মাঠ কর্মীদের কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কাজের মধ্যে ভিন্নতা আনার লক্ষ্যে ও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের যৌথ দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে একজন স্বাস্থ্যকর্মী নিজ দায়িত্ব পালন করার পাশাপাশি জন্মনিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে। একইভাবে একজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী নিজেদের কাজের অতিরিক্ত হিসেবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে।

৫. **আর্থিক প্রণোদনা ব্যবস্থা:** থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মীদের মধ্যে কাজের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করতে প্রনোদনা হিসেবে আর্থিক পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পুরষ্কারের ধরণ কর্মী এবং ডাক্তার ভেদে ভিন্ন হয়। থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের একজন কর্মী পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলে পুরষ্কার হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। আবার, একজন ডাক্তার স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ এবং I.U.D পদ্ধতির ক্ষেত্রে তার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলে পুরষ্কার হিসেবে তাকে দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষনে পাঠানোর ব্যাবস্থা করা হয়। এছাড়া যেসব পুরুষ ও মহিলা স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ পদ্ধতি গ্রহণ করে তাদেরকেও বিভিন্ন পুরষ্কার প্রদান করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে জানবেন এবং কিভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় সেই সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। তাই এদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং ব্যর্থতায় পরিপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বর্তমানে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তরের অধীনে কতজন মাঠকর্মী রয়েছে?

ক) ৪০০০০ খ) ৫০০০০ গ) ২০০০০ ঘ) ৩০০০০

২। পদ্ধতি কোন সেবার সাথে সম্পর্কযুক্ত?

ক) ইন্টারনেট সেবা খ) জন্ম নিয়ন্ত্রণ সেবা গ) শিক্ষা সেবা ঘ) যাত্রী সেবা।

পাঠ ৪.৬ মানবসম্পদ উন্নয়ন
Human Resource Development

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- মানবসম্পদ উন্নয়নের উপাদানসমুহ চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মানবসম্পদের বর্তমান চিত্র তুলে ধরতে পারবেন;
- বাংলাদেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচীর বিবরণ দিতে পারবেন।

মূলপাঠ

মানবসম্পদ উন্নয়ন

মানবসম্পদ উন্নয়নের অর্থ: উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োজিত মানুষের কর্মকুশলতা অর্থাৎ কাজের গুণগত মানের ওপর উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মান এবং পরিমাণ নির্ভর করে। উৎপাদনে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কর্মকুশলতা বেশি অর্থাৎ তারা দক্ষ হলে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার মান উন্নয়ন ও পরিমাণ বেশি হয়; এর বিপরীত ঘটলে দ্রব্য ও সেবার মান নিচু এবং উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়। সুতরাং গুণ ও মানের দিক থেকে সমৃদ্ধ এবং বেশি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করতে দক্ষ কর্মী মানুষের প্রয়োজন পড়ে। আর বেশি সংখ্যক এ ধরনের দক্ষ কর্মী মানুষ গড়াই হল মানব সম্পদ উন্নয়ন।

বস্তুত উৎপাদনের বিভিন্নক্ষেত্রে মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করে তোলাকেই মানব সম্পদ উন্নয়ন বলে। বিশদভাবে বলতে গেলে, মানুষ্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগত, সামাজিক , অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোর উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটিয়ে একদিকে তাদেরকে বিভিন্ন কাজের জন্য উপযুক্ত করা এবং অন্যদিকে, তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নই হল মানব সম্পদ উন্নয়ন। এ প্রক্রিয়ায় সমাজে বসবাসরত সকল মানুষের সম্ভাবনা, জ্ঞান ও কাজ করার উৎকর্ষতা অব্যাহতভাবে বাড়ে এবং তারা দক্ষ হয়ে ওঠে। অর্থনীতিবিদ জে. ডি. সেথি বলে, 'মানব সম্পদ উন্নয়ন যদি সামগ্রিক উন্নয়ন হিসেবে বিবেচিত হয় তাহলে তা মানুষের ভেতরে বিদ্যমান বৃদ্ধিবৃত্তিক, কারিগর, উদ্যোক্তীয় এমন কি নৈতিক সামর্থ্যগুলোর সর্বাধিক ব্যবহার বোঝায়, এটি নতুন নতুন সামর্থ্য সৃষ্টিও বোঝায়।

মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদানসমূহ: যেসব সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটানো যায় সেগুলোই হল মানব সম্পদ উন্নয়নের উপাদান। এসব সুযোগ-সুবিধার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আশ্রয়, দূষণমুক্ত পরিবেশ, আইন ও শৃঙ্খলা এবং দুর্নীতিমুক্ত স্বাধীন ও সম্মানজনক জীবন প্রভৃতি প্রধান। অর্থনীতিবিদ মিরড্যাল মানব সম্পদ উন্নয়নের আটটি উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন যেমন-

(১) খাদ্য ও সৃষ্টি,
(২) বস্ত্র ,
(৩) বাসস্থান ও তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা,
(৪) স্বাস্থ্য সুবিধা,
(৫) শিক্ষা,
(৬) গণ সংযোগ মাধ্যম,
(৭) শক্তিভোগ এবং
(৮) পরিবহন।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে মানবসম্পদের প্রকৃতি: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানব সম্পদের প্রকৃতি একরূপ নয়। ভৌগলিক ও বংশগত কারণ, জাতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মীয় চেতনা, মুল্যবোধ ইত্যাদি জাতির গুণগত তথ্য মানব সম্পদেও মান নির্ধারণ করে। উন্নত দেশগুলোতে বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ, অস্ট্রেলিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের জনসংখ্যার গুণগত মান অনেক উচু অর্থাৎ এসব দেশের মানব সম্পদ উন্নত বা দক্ষ।

অন্য দিকে বেশিরভাগ উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যার গুণগত মান অত্যন্ত নিচু। গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, নিরক্ষরতা, খাদ্যাভাব, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা প্রভৃতি কারণে এসব দেশের জনসংখ্যার গুনগত মান অত্যন্ত নিচু অর্থাৎ এসব দেশের মানব সম্পদ অনুন্নত বা অদক্ষ।

বাংলাদেশে মানব সম্পদের বৈশিষ্ট্য সমূহ:

বাংলাদেশের মানব সম্পদ উচ্চমান সম্পন্ন নয়। অর্থনীতিবিদগণ একটি দেশের জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে মানব উন্নয়ন সূচক নির্ণয় করেছেন। এসব সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের মানব সম্পদের অবস্থা প্রতিবেশী স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তুলনায়ও ভাল নয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের HDI (Human Development Index) ছিল যথাক্রমে ০.৩০৯, ০.৩৮২ এবং ০.৩৯৩। নিম্নে বাংলাদেশের মানব সম্পদের বর্তমান অবস্থার (বৈশিষ্ট্য) একটি চিত্র তুলে ধরা হল।

জাতিগত বৈশিষ্ট্য: জাতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর শ্রমিকের কর্মকুশলতা ও কর্মদক্ষতা নির্ভর করে। জার্মানির নাৎসী দল তার নেতা হিটলার ও এরূপ ধারণা পোষণ করতেন। জাতিগতভাবে বাংলাদেশের সব অঞ্চলের মানুষ সুঠাম দেহ ও অমিত শক্তির অধিকারী নয়। দেশের অভ্যন্তরে জাতিগত ব্যবধানের কারণে শ্রমশক্তির মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে।

প্রকৃতি ও আবহাওয়া: শীতপ্রধান দেশের মানুষ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষের তুলনায় অধিক পরিশ্রমী হয়। কারণ শীতপ্রধান দেশে দীর্ঘকালীন পরিশ্রমেও শরীরে ক্লান্তি আসে না। বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে এক টানা অধিক সময় কাজ করা যায় না। অল্প সময়ের মধ্যেই কর্মে ক্লান্তি আসে। ফলে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে শ্রমশক্তির মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

উন্নত আর্থিক সামর্থ্যতা ও নৈতিক চরিত্র: উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়। বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে আর্থিক সামর্থ্যতা আছে এবং কর্মনিষ্ঠার একান্ত অভাব রয়েছে। কঠোর তদারকি ছাড়া কাজ আদায় করা কঠিন। ফলে মজুরির সাথে তদারকি খরচ যুক্ত হওয়ায় এদেশে শ্রম ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে।

দারিদ্র্য: বাংলাদেশের প্রায় ৪৪% লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এসব দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর উৎপাদন ক্ষমতা কম। তাছাড়া দরিদ্রতার কারণেই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে না। কারণ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় নির্বাহ করতে হয়।

সুষম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাব: বাংলাদেশের শ্রমিক সম্প্রদায় অশিক্ষিত। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের অভাবে এদেশের শ্রমিকদের চিন্তা ও মননশক্তি বিকশিত হয় না। তাই এদের উৎপাদন ক্ষমতা কম ও মানব সম্পদ অনুন্নত।

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য: সুস্বাস্থ্যের অধিকারী শ্রমিকের দক্ষতা বেশি হয়। কিন্তু দারিদ্রের কারণে উপযুক্ত খাদ্য, চিকিৎসা ও অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবার অভাবে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকাংশই রুগ্ন স্বাস্থ্য, দুর্বল শরীর কাঠামো, ভগ্ন স্বাস্থ্য ও দুর্বল মন-মানসিকতা। ফলে তাদের কর্মক্ষমতা ও উৎপাদন ক্ষমতা কম।

বাসগৃহ ও বসবাস: বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিক কারখানার নিকটবর্তী বস্তি এলাকায় নিজেরা জোট বেধে ছোট ছোট খুপরিতে পরিবার-পরিজন নিয়ে একত্রে গাদাগাদি হয়ে বাস করে। ফলে তাদের মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় ও তাদের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে অনুন্নত আবাসনের কারণে মানব উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না।

নিম্ন মাথাপিছু আয়: বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় মাত্র ১,৩৫৮.৮ ডলার (WB 2016)। পক্ষান্তরে , জাপানের বর্তমান মাথাপিছু আয় ৩৯,৬৪০ ডলার। এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্থানের মাথাপিছু আয় অনেক বেশি। নিম্ন মাথাপিছু আয়ের কারণে আমাদের মানব সম্পদ নিম্নমানের।

আয়ুস্কাল: মানুষের কর্মক্ষম জীবনকাল তার আয়ুষ্কালের উপর নির্ভরকরে। যার আয়ুস্কাল যত বেশি, তার কর্মক্ষম জীবনকালও তত বেশি। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৭১.৬ বছর (এপ্রিল, ২০১৭)। পক্ষান্তরে, জাপানের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৮৫ বছর। বাংলাদেশের জনগণের নিম্ন আয়ুষ্কাল এদেশের অুন্নত মানব সম্পদেরও ইঙ্গিত বহন করে।

জীবনযাত্রার মানঃ বাংলাদেশের মানুষের জীবযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। অনেক সময় তারা জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে ভোগ কতে পারে না। ফলে তাদের কর্মদক্ষতা আজীবন নিম্ন পর্যায়েই থেকে যায়।

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, বাংলাদেশের মানব সম্পদ এখনও অনুন্নত। অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করতে হলে আমাদেরকে যে কোনো মূল্যে মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মানব সম্পদ উন্নয়ন ব্যতীত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

মানব সম্পদ বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচীর বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হল।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা মানবসম্পদ উন্নয়নের সংজ্ঞা, উপাদান এবং বাংলাদেশের মানব সম্পদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানবেন।

সারসংক্ষেপ

- মানুষের কর্মদক্ষতা সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তার অন্তর্নিহিত বিভিন্ন কর্মগুণ উন্নত ও বিকশিত করে তোলাই মানব সম্পদ উন্নয়ন।
- বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বহু পশ্চাৎপদতা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। অর্থনীতিবিদ মিরডাল মানব সম্পদের কয়টি উপাদানের কথা বলেছেন?
ক) ১০টি খ) ৮টি গ) ৬টি ঘ) ৭টি

২। বাংলাদেশে কত ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে?
ক) ৪০ ভাগ খ) ৪৪ ভাগ গ) ৫০ ভাগ ঘ) ২০ ভাগ

৩। বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান মাথাপিছু গড় আয়–
ক) ১৬১০ ডলার খ) ১৬০০ ডলার গ) ১৩৫০ ডলার ঘ) ১৫৫০ ডলার

৪। বাংলাদেশের মানুষের বর্তমান গড় আয়ুষ্কাল কত বছর?
ক) ৬৭ বছর খ) ৬৫ বছর গ) ৭১.৬ বছর ঘ) ৬৮.৫ বছর।

পাঠ ৪.৭ বেকারত্ব ও আত্মকর্মসংস্থান
Unemployment and Self-employment

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা-

- বেকারত্বের বিভিন্ন ধরণ সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবেন;
- আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয় বিষয়সমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মূলপাঠ

বেকারত্ব এবং এর ধরণ

কর্মক্ষম লোক প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কাজ না পাওয়ার অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়। অর্থনীতিতে বেকারত্ব বলতে অনিচ্ছাকৃত বেকারত্ব বা কর্মহীনতাকে বোঝায়। অবশ্য মানসিক বা শারীরিক অক্ষমতার জন্য যারা কাজ করতে অক্ষম এবং প্রচলিত মজুরিতে কাজ করতে অনিচ্ছুক তাদেরকে বেকারের মধ্যে ধরা হয় না। অধ্যাপক. এ. সি. পিগু বলেন 'সে অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয় যখন কর্মক্ষম ব্যক্তিরা প্রচলিত মজুরিতে কাজে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পায় না'। বেকারত্ব নানা ধরনের হতে পারে। নিচে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের বিবরণ দেয়া হলঃ

১। **মৌসুমী বেকারত্ব :** মৌসুমীগত কারণে বছরের নির্দিষ্ট সময় ধরে শ্রমিকদের মধ্যে যে কর্মহীনতা দেখা দেয় তাকে মৌসুমী বা ঋতুগত বেকারত্ব বলে। যেমন, বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্র, চিনিকল, পাটকল, গৃহ নির্মাণ প্রভৃতিতে বছরের যে সময়ে কাজ থাকে না সে সময়ে কর্মের অভাবে সেখানকার শ্রমিকরা বেকার জীবন যাপন করে। এ ধরনের বেকারত্বই হল মৌসুমী বেকারত্ব। বাংলাদেশের মত কৃষিপ্রধান দেশে এ ধরনের কর্মহীনতা প্রকট।

২। **সংঘাতজনিত বেকারত্ব :** শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব, কাঁচামালের সাময়িক ঘাটতি, যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার বিকলতা, আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রভৃতি কারণে যে সাময়িক কর্মহীনতা সৃষ্টি হয় তাকে সংঘাত জনিত বেকারত্ব বলে। অর্থনীতিতে যে কোন সময়ে এমন বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।

৩। **কারিগরি বেকারত্ব :** শিল্পক্ষেত্রে নতুন কলা-কৌশল এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে পুরাতন শ্রমিকদের পক্ষে অনেক সময় কাজ করা সম্ভব হয় না। ফলে তারা বেকার হয়ে পড়ে। এরূপ বেকারত্বকে কারিগরি বেকারত্ব বলে।

৪। **অনিয়মিত বেকারত্ব :** কোন কোন পেশায় শ্রমিকের কাজের চাহিদা বিশেষভাবে অনিয়মিত হওয়ায় এরূপ বেকারত্ব দেখা যায়। বন্দরকর্মী ও বাংলাদেশের গ্রামীণ পূর্ত কর্মসূচীতে নিয়োজিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে অনিয়মিত বেকারত্ব দেখা দেয়।

৫। **বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব :** বাণিজ্যচক্রের আবর্তনে ব্যবসা-বাণিজ্য ও উৎপাদনক্ষেত্রে কখনও তেজীভাব আবার কখনও মন্দাভাব সৃষ্টি হয়। অর্থনৈতিক মন্দার সময় উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে শ্রমের চাহিদা কমে যায়। এর ফলে যে শ্রম-বেকারত্ব দেখা দেয় তাকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলে।

৬। **ছদ্মবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব :** যখন কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োজিত থাকে তখন ঐ উদ্বৃত্ত শ্রমিকদেরকে ছদ্মাবেশী বা প্রচ্ছন্ন বেকার বলে। এক্ষেত্রে উৎপাদন প্রণালি অপরিবর্তিত রেখে এ অতিরিক্ত সংখ্যক শ্রমিককে সরিয়ে নিলে উৎপাদন হ্রাস পায় না। বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে জনাধিক্যের চাপ থাকায় এরূপ বেকারত্ব বিদ্যামান।

আধুনিক বিশ্বে বেকারত্ব একটি বহুল আলোচিত বিষয়। উন্নত বা উন্নয়নশীল যে কোন দেশেই এ সমস্যা বর্তমান। তবে কৃষিপ্রধান ও জনবহুল দেশগুলোতে এ সমস্যা প্রকট। বাংলাদেশে বেকার সমস্যা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত।

আত্মকর্মসংস্থানের ধারণা

নিজেই নিজের কর্মসংস্থান করাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আরও একটু স্পষ্ট করে বলা যায় যে, নিজস্ব অথবা ঋণ করা স্বল্প সম্পদ, নিজস্ব চিন্তা, জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ন্যূনতম ঝুঁকি নিয়ে আত্মপ্রচেষ্টায় জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থাকে আত্মকর্মসংস্থান বলা হয়। যখন কোনো ব্যক্তি সেবাদানের বিনিময়ে বা ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন এবং জীবিকা নির্বাহ করে তাকে আত্মকর্মসংস্থান বলে। আত্মকর্মসংস্থানকারী ব্যক্তি নিজেকে কোনো না কোনো ব্যবসায়ের কাজে নিয়োজিত করে। একজন গৃহিনী ঘরে বসে হাঁস-মুরগি, জাল বুনন, পোশাক তৈরি প্রভৃতি কাজ করে অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। ভূমিহীন, বিত্তহীন, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকার যুব সমাজ স্বল্প প্রশিক্ষণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত থাকতে পারে । তারা নিজ উদ্যোগে ছোটখাটো মাছের খামার, গরু-ছাগলের খামার, ফলের চাষ, মৌমাছি চাষ, ফুল চাষ, সবজি খামার ও নানা প্রকার বৃত্তিমূলক কাজের মাধ্যমে নিজের কর্মসংস্থান নিজেরাই করতে পারে। এ কাজে তেমন কোনো মূলধন প্রয়োজন হয় না। এর জন্য প্রয়োজন উদ্যোগ, দুটি কর্মঠ হাত, স্বল্প প্রশিক্ষণ ও প্রবল আত্মবিশ্বাস।

আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ প্রায় ১৬ কোটি মানুষের দেশ। শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। তাদের যেমন-নেই লেখাপড়া, তেমন নেই কর্মসংস্থানের সুযোগ। তাই কর্মসংস্থানের সন্ধানে মানুষ প্রতিনিয়ত শহরে ভিড় জমাচ্ছে। শহরে বাড়ছে জনসংখ্যার চাপ। দেশের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে যুবক-যুবতী। এর মধ্যে প্রায় দুই কোটি যুবক-যুবতী বেকার। অথচ যুবক-যুবতীরাই হচ্ছে দেশ ও জাতির প্রাণশক্তি এবং সকল কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি ও ভবিষ্যতের কর্ণধার। আজকের বাংলাদেশের বেকার যুব সমাজের চিত্র শুধু উদ্বেগজনক নয়, ভয়ঙ্করও বটে। এ ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে সমাজে শুধু যে হতাশা বাড়ছে তা নয়, বরং নানাবিধ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দ্বারাও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে শান্তি-শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও নিরাপত্তা, বাড়ছে অস্থিরতা ও সামাজিক অপরাধ। তাই শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যুব শক্তিকে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সুসংগঠিত উদ্যোগ। বৃত্তিমূলক ও পেশাগত প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে যুবকদের বিভিন্ন বৃত্তিতে দক্ষ করে আত্মকর্মসংস্থানের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে। বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আত্মকর্মসংস্থান ছাড়া আমাদের ব্যাপক বেকারত্ব মোকাবিলায় আর অন্য কোনো গত্যন্তর নেই। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আত্মকর্মসংস্থানের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। যুব সমাজের আগ্রহ সৃষ্টি এবং তাদের জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে দেশের বেকার সমস্যাই শুধু নিরসনই হবে না বরং সামাজিক অপরাধ, বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তাহীনতা থেকে দেশকে বাঁচানো যাবে।

উপরের আলোচনা থেকে প্রাপ্ত আত্মকর্মসংস্থানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব নিচে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

(ক) বেকারত্ব দূরীকরণ।

(খ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দূরীকরণ।

(গ) আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে শহরমূখী জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতি ও সমাজের ভারসাম্য রক্ষা।

(ঘ) জনশক্তি সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন।

(ঙ) দেশ প্রেমে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করা এবং স্বেচ্ছামূলক কাজে উৎসাহিত করে।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র

বাংলাদেশ একটি দরিদ্রপীড়িত জনবহুল দেশ। দেশে যে হারে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার চেয়ে অনেক কম হাওে চাকরির সুযোগ বাড়ছে। দেশের বৃহত্তম যুব সমাজ চাকরির পিছনে ধাওয়া না করে আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে। এজন্য যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। আত্মকর্মসংস্থানের গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রনালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা প্রভৃতির ওপর। এ অধিদপ্তর ও সংস্থা আত্মকর্মসংস্থানের কতগুলো ট্রেড চিহ্নিত করেছে এবং প্রশিক্ষণ ও ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে। নিচে আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগুলো উল্লেখকরা হলো:

১. হাঁসমুরগি পালন, ২. গবাদিপশু পালন ও ছাগল পালন ৩. মৎস্য চাষ, ৪. সবজি ও ফল বাগান তৈরি, ৫. ফুলের চাষ, ৬. নার্সারি/বনায়ন, ৭. মৌমাছি চাষ, ৯. বাঁশ ও বেতের কাজ, ১০. হস্তশিল্প, কুটির শিল্প, মৃৎশিল্প, ১১. সেলাই/পোশাক তৈরি, ১২. আচার/জ্যাম/জেলি প্রস্তুতকরণ, ১৩. ব্লক ও বুটিক প্রিন্ট, ১৪. শাড়ি ও পোশাক নকশা, ১৫. কাপড়/চামড়ার ব্যাগ তৈরি ১৬. পশুখাদ্য প্রস্তুতকরণ, ১৭. পাটি বুনন, ১৮. নকশিকাঁথা, ১৯. ওয়েলডিং, ২০. উন্নতমানের মাটির চুলা

তৈরি, ২১. ইলেক্ট্রিক ওয়্যারিং, ২২. রিকশা, সাইলে, মোটর সাইকেল ও গাড়ি মেরামত, ২৩. উল বোনা, ২৪. রেফ্রিজারেটর অ্যান্ড এয়ারকন্ডিশন মেরামত, ২৫. রেডিও, টিভি, ভিসিআর, মোবাইল সেট ভিসিডি মেরামত, ২৬. কম্পিউটার অপারেশন ও মেরামত, ২৭. গ্রামীণ স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরি, ২৮. রবার চাষ, ২৯. পাম্প চালনা, ৩০. গাড়ি চালনা, ৩১. সাম্প্রতিক মাসে বহুল আলোচিত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলায় বরই গাছে লাক্ষা পোকার চাষ। এ পোকার ত্বকের নিচে জমানো গ্রন্থি থেকে আঠালো রস ক্রমান্বয়ে শক্ত হয়ে লাক্ষা তৈরি হয়। যা কাঠের আসবাবপত্র বার্ণিশ, বিভিন্ন রকমের পেইন্ট, চামাড়ার রং ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হয়। লাক্ষা চাষের বিষয়টি আত্মকর্মসংস্থানের জন্য একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। সরকারি এবং এন.জি.ও পর্যায়ে আরও নতুন নতুন ট্রেড অন্তর্ভূক্ত করা এবং সে সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণের চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

আত্মকর্মসংস্থানের জন্য করণীয়

বাংলাদেশের মতো ছোট অথচ অত্যন্ত জনবহুল দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি সহজ নয়। দেশে চাকরির সূযোগ সীমিত। সরকারি খাতে ইচ্ছা করলেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যায় না। দেশে শিল্পায়নের হার সন্তোষজনক নয়। সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো এ বিপুল সংখ্যক বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য যথেষ্ট নয়। ফলে বেকারদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

১. বেকারদের শিক্ষা দিতে হবে যেকোন কাজই ছোট বা অপমানজনক নয়।
২. আত্মকর্মসংস্থানের উপযোগী ক্ষেত্রগুলোকে চিহ্নিত করে তাদেরকে সকল ট্রেডে অপ্রাতিষ্ঠানিক ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
৩. স্কুল, কলেজ থেকে ছিটকে পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।
৪. বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীরা যাতে দ্রুত ও যথাযথভাবে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে উদ্যোগ নিতে পারে সেজন্য উপদেশ বা পথনির্দেশ দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ঋণদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
৫. সর্বস্তরের শিক্ষাকে কর্মমূখী করার ওপর জোর দিতে হবে। পাঠ্যসূচীতেও বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।
৬. পল্লী অঞ্চলে স্থানীয় সম্পদ ও প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে কৃষি ও শিল্পের ওপর বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।
৭. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য যুব ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ব্যাংক থেকে সহজ শর্তে ঋনের ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ

শিক্ষার্থীরা বেকারত্ব থেকে বের হয়ে কিভাবে আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে এ বিষয়ে অনেক রকম জ্ঞান অর্জন করবেন।

সারসংক্ষেপ

- বাংলাদেশ একটি জনসংখ্যা বহুল দেশ হওয়ায় এখানে বেকার সমস্যা প্রকট। বেকারত্ব লাঘবে আত্মকর্মসংস্থান অত্যন্ত জরুরী। আত্মকর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ব্যবস্থা সরকার হাতে নিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ছদ্ম বেকারত্ব কি?

ক) প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত শ্রমিক
খ) অদক্ষ পেশাজীবী
গ) দুর্বল বেকার শ্রমিক
ঘ) প্রযুক্তি জ্ঞানহীন শ্রমিক

২। বাংলাদেশের কোথায় লাক্ষা চাষ করা হচ্ছে?

ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ খ) খুলনা গ) কুমিল্লা ঘ) দিনাজপুর।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. "X" দেশে শিক্ষার হার কম থাকলেও দেশটির জনগণ সুখে-শান্তিতে বাস করতো। দেশটি এক সময় সম্পদে ভরপুর ছিল। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে দেশটি বর্তমানে জনগনের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে হিমশিম খাচ্ছে। ফলে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন- চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি বেড়েই চলেছে। দেশটিতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ক। জনসংখ্যার ঘনত্বের সূত্রটি কি?

খ। অতিরিক্ত জনসংখ্যা কিভাবে নিম্ন জীবনযাত্রার মান এর কারণ হিসেবে কাজ করে?

গ। উদ্দীপকের সাথে ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্বের সাদৃশ্য রয়েছে কি? কেন?

ঘ। "X" দেশের বর্তমান পরিস্থিতি হতে উত্তরণের উপায়গুলো কি হতে পারে।

২. করিম উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার পরও দেশে কোন চাকুরী যোগার করতে পারেনি। কারণ দেশে চাকুরীর সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি চাকুরী প্রার্থী। সে সাধারণ শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছে। চাকুরী না পেয়ে নিজ গ্রামে একটি ছাগলের খামার গড়ে তোলেন। এখন তার খামার একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান। তিনি বর্তমানে নিজে আত্মনির্ভরশীল এবং পরিবারকেও আর্থিক সহায়তা করতে সমর্থ।

ক। কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বটি কী?

খ। অধিক জনসংখ্যা বাংলাদেশের প্রধান সমস্যা ব্যাখ্যা করুন।

গ। করিমের কর্মসংস্থান কী প্রকৃতির– ব্যাখ্যা করুন।

ঘ। বর্তমানে দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের করণীয় কি?

উত্তরমালা

পাঠ ৪.১:	১। গ	২। গ	৩। গ	
পাঠ ৪.২:	১। ক	২। ঘ	৩। খ	
পাঠ ৪.৩:	১। গ	২। ক	৩। গ	৪। গ
পাঠ ৪.৪:	১। গ	২। খ	৩। গ	
পাঠ ৪.৫:	১। ঘ	২। খ		
পাঠ ৪.৬:	১। খ	২। খ	৩। ক	
পাঠ ৪.৭:	১। ক	২। ক		